রানী ভবানী

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকর্তার নূতন শিক্ষা-ধারা অনুসারে বিদ্যালয়সমূহের
তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর উপপাঠ্যরূপে অনুমোদিত।
(কলিকাতা গেজেট, ৭ই মে, ১৯৪০)

আর্যলক্ষ্মী সিরিজ ৩নং গ্রন্থ

পদ্মিনী, কৃষ্ণকুমারী, মীরাবাঈ, রাজ্যশ্রী, গার্গী, অরুন্ধতী, কর্মদেবী প্রণেতা

শ্রীমতী প্রীতিকণা দত্তজায়া

প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব-সাহিত্য-কুটীর
২২।৫, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

পুনর্মুদ্রণ—
জ্যৈষ্ঠ
১৩৬৩
২

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

দাম—
ছয় আনা

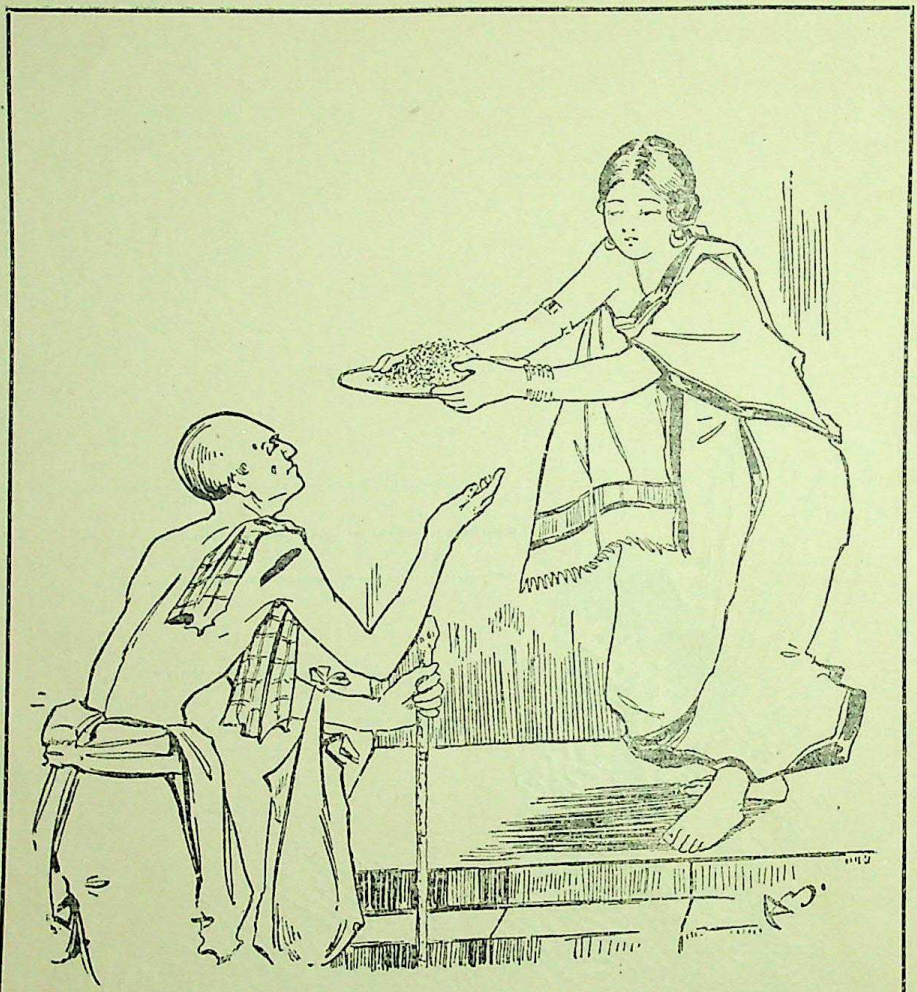

"মা, দুটি ভিক্ষা দাও মা!"

রাণী ভবানী

এক

—"মা, দুটি ভিক্ষা দাও মা !"

রাজসাহী জেলার ছাতিনা গ্রামে আত্মারাম চৌধুরীর বাস। এঁরা বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ। আত্মারামের অবস্থা বেশ সচ্ছল। বারো মাসে তের পার্বণ ক'রে বেশ সুখেই একরকম দিন কাটে। দীন-দুঃখা, অতিথি-অভ্যাগত তাঁর বাড়ী থেকে কখনো হতাশ হয়ে ফিরে যায় না।

সকালবেলা। ভিখারী দোর-গোড়ায় এসে ডাকলো,—"মা, দুটি ভিক্ষা দাও মা !"

একটি ছোট ফুটফুটে মেয়ে,—চাঁদের জ্যোৎস্নার মত তার রূপ,—শিউলী-তলায় বাঁধা শানের উপর ব'সে ফুলের মালা গাঁথছিলো, ভিখারীর ডাক শুনেই তাড়াতাড়ি উঠে ঘরে ছুটে গেল। একটু পরেই এক থালা চাল, ডাল, চারটি পয়সা, কিছু আলু, বেগুন, কাঁচকলা এনে ভিখারীর আঁচলে ঢেলে দিলে।

ভিখারী একগাল হেসে বললে, "এসো মা অন্নপূর্ণা, রাজরাণী হও মা।"

মেয়েটি ভিখারীর মুখের দিকে চেয়ে অবাক্ হয়ে বললে, "আমার নাম অন্নপূর্ণা নয় গো, আমার নাম ভবানী।"

এমন সময় ঠাকুর-ঘর থেকে মা ডাকলেন,—"ভব, আজ বুঝি ঠাকুরের চন্দন ঘষতে ভুলে গেছিস্ মা !"

ভবানী রোজ ঠাকুর পূজার যোগাড় ক'রে দেয়; ফুলতোলা

থেকে আরম্ভ ক'রে ঠাকুরের বাসন মাজা, ঘর লেপা, ধূপ-দীপ সাজানো, চন্দন ঘষা—সবই ভবানীর নিজের হাতে করা চাই। কেবল নৈবেদ্যটা মা নিজে সাজিয়ে নেন ; কারণ, অতটুকুন মেয়ের দ্বারা হয়ে ওঠে না। মায়ের কথায় আজ ভবানী বড্ড লজ্জা পেলে। তাইতো, চন্দন ঘষা হয়নি যে! সে অতি লজ্জিতভাবে অপরাধীর মত মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

মা মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, "ভিখারী কি জিজ্ঞেস করছিলো তোকে ?"

—"আমায় অন্নপূর্ণা ব'লে ডেকেছিল, আমি বললুম, আমার ও-নাম নয়, আমার নাম—ভবানী।"

মা মনে-মনে ঠাকুরকে জানালেন, "ঠাকুর, মা যেন আমার সত্যি অন্নপূর্ণাই হয়!"

* * * *

ভিখারীর কথা শেষে অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি হয়েছিল। ভবানী রাজরাণী হয়ে অন্নপূর্ণার মত দীনদুঃখীকে অন্নদান ক'রে সংসারে যে কীর্তি রেখে গেছেন, তাতে সমস্ত ভারতবর্ষে তাঁর নাম অমর হয়ে আছে। আজও লক্ষ-লক্ষ লোক রাণী ভবানীর দয়ার ও গুণের কথা কীর্তন ক'রে থাকে।

দুই

আমরা যে-সময়ের কথা বলছি, তখনো এদেশে ইংরেজের আমল পড়েনি। তখন দেশ ছিল মুসলমানদের হাতে। ইংরেজরা তখন এদেশে বাণিজ্য করতো।

নাটোর—রাজসাহী জেলায়। তখন নাটোরের প্রকাণ্ড

জমিদারী। রাজা রামজীবন রায় সেই জমিদারীর মালিক। প্রজাদের মুখে তাঁর সুখ্যাতি। সারা দেশে তাঁর সুনাম! রামজীবন তাঁর একমাত্র আদরের পুত্র রামকান্তের বিয়ের জন্যে একটি ভালো বংশের সুন্দরী পাত্রীর জন্যে দেশে-দেশে লোক পাঠালেন।

ঘটকেরা দেশে-দেশে ঘুরে এসে সংবাদ দিলে,—ছাতিনা গ্রামের আত্মারাম চৌধুরীর মেয়ে ভবানীর মত সুন্দরী মেয়ে আর তারা কোথাও দেখতে পেলে না। মেয়েটি যেন রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী! নাটোর-রাজের পুত্রবধূ হওয়ার উপযুক্ত বটে।

দয়ারাম রাজা রামজীবনের পুরাণো কর্মচারী। কর্মচারী হলেও রামজীবন তাঁকে খুব সম্মান করতেন। তাঁর পরামর্শ না নিয়ে তিনি কোনো কাজ করতেন না। রামকান্তের বিয়ের পাত্রী দেখবার জন্যে তিনি দয়ারামকেই ছাতিনায় পাঠালেন।

দয়ারাম রায় ছাতিনায় এসে ভবানীকে দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। অমন রূপ, অমন লক্ষ্মীশ্রী, এইরকম একখানি হাসিভরা-মুখ যেন জীবনে তিনি কখনো দেখেননি! তিনি আত্মারাম চৌধুরীকে বললেন, "দেখুন চৌধুরীমশাই, স্বয়ং মা লক্ষ্মী আপনার ঘরে বিরাজ করছেন; আমি এ-লক্ষ্মী নাটোর রাজবাড়ীতে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করবো। আপনার এ-মেয়ে রাজরাণী না হয়ে যায় না।"

দয়ারাম সেইদিনই বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক ক'রে ভবানীকে আশীর্বাদ ক'রে নাটোরে চ'লে এলেন।

নাটোরের রাজা রামজীবন রায়ের একমাত্র ছেলের বিয়ে। চারদিকে আনন্দের সাড়া প'ড়ে গেল।

শুভদিনে শুভলগ্নে কুমার রামকান্তের সঙ্গে ভবানীর বিয়ে হয়ে

গেল। অমন বড়-ঘরের রাজার ছেলের সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় সকলেই ভবানীর অদৃষ্টের প্রশংসা করতে লাগলো।

দয়ারাম সেইদিনই বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক ক'রে, ভবানীকে আশীর্বাদ ক'রে নাটোরে চ'লে এলেন।

তারপর ছোট্ট মেয়ে ভবানী বাপের বাড়ী অন্ধকার ক'রে নাটোরের রাজবাড়ী আলো করবার জন্য রাজ-পুত্রবধূ-রূপে নাটোরে এলো। বউ দেখে লোকেরপ্রশংসা আর ধরে না। সবাই বলতে লাগলো,—বৈকুণ্ঠ অন্ধকার ক'রে লক্ষ্মী নাটোর রাজবাড়ীতে এসেছেন!

তিন

কয়েক বছর পরে রাজা রামজীবন মারা গেলেন। রামকান্ত হ'লেন নাটোরের রাজা, আর ভবানী হ'লেন সে রাজ্যের রাণী। তখন ভবানীর বয়স মাত্র পনের বছর।

রামকান্ত রাজা হ'য়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে লাগলেন। যে দয়ারামকে রাজা রামজীবন সম্মান করতেন, ছোট বড় সব কাজেই তিনি যাঁর পরামর্শ নিতেন, সেই বৃদ্ধ দয়ারামকে রামকান্ত একদিন কয়েকটা খুব কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন।

দয়ারাম এতে মনে বড় ব্যথা পেয়ে নাটোর ছেড়ে একেবারে মুর্শিদাবাদে চ'লে গেলেন। যাবার সময় তিনি রামকান্তকে ব'লে গেলেন, "দেখি, তোমার রাজাগিরি কতদিন চলে!"

তখন মুর্শিদাবাদ বাংলার রাজধানী। আলিবর্দী খাঁ বাংলার নবাব। দয়ারাম একেবারে তাঁর দরবারে এসে হাজির। আলিবর্দী খাঁ দয়ারামকে খুব ভাল ভাবেই চিনতেন। রামকান্ত কুসংসর্গে প'ড়ে নিজে ত' অধঃপাতে যাচ্ছিলেনই, অতবড় রাজ্যটাকেও নষ্ট ক'রে ফেলছিলেন। রামকান্তকে উচিত শিক্ষা দেওয়া এবং নাটোরের জমিদারী রক্ষা করা,—এই দুই উদ্দেশ্য নিয়ে দয়ারাম মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন।

নবাব-দরবারে গিয়ে দয়ারাম আলিবর্দীকে বললেন,—রাজা রামকান্ত জমিদারী পেয়ে বড্ড বেড়ে উঠেছে ; সে প্রজাদের দুঃখকষ্ট

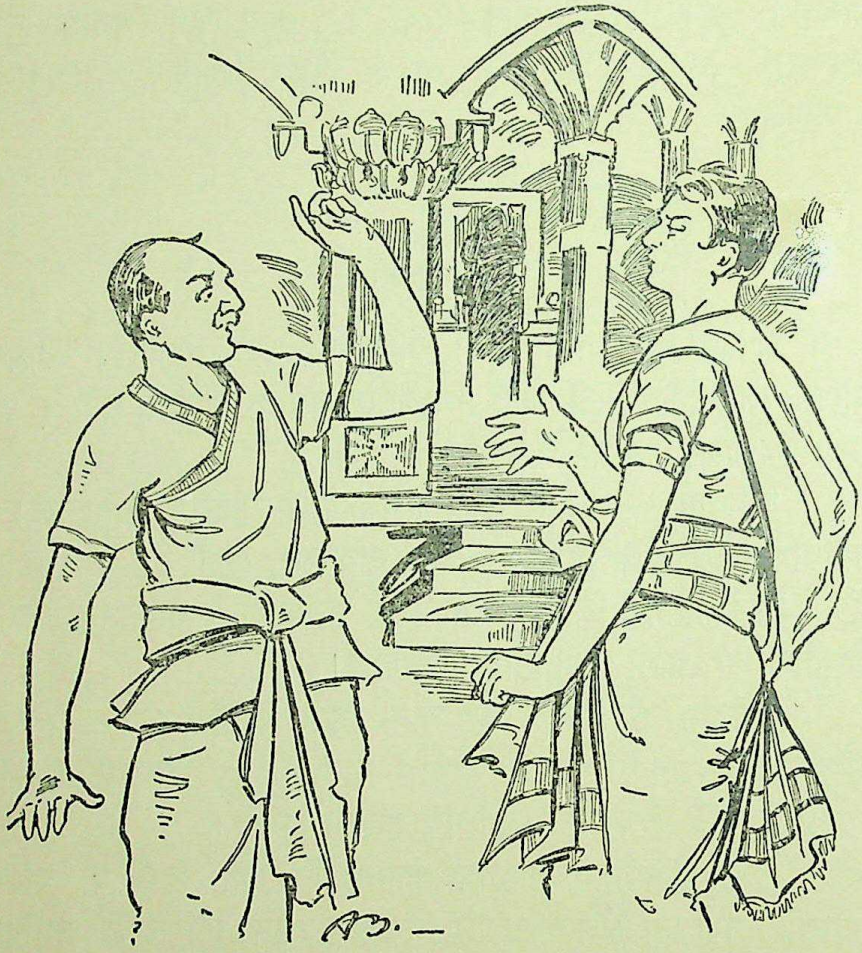

"দেখি, তোমার রাজাগিরি কতদিন চলে!"

দেখে না, রাজ্যের ভালমন্দের দিকে তার লক্ষ্য নাই, কুসঙ্গীদের সঙ্গে মিশে সে একেবারে অধঃপাতে যাচ্ছে। বহু টাকা তার ঘরে মজুত, তবু নবাবের খাজনা সে বন্ধ ক'রে রেখেছে।

নবাব এ কথা শুনে রাগে একেবারে জ্ব'লে উঠলেন। নাটোর রাজ্য রামকান্তের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তাঁর এক জ্ঞাতি ভাইপো দেবীপ্রসাদের হাতে দেওয়ার হুকুম হ'লো। আর একদল সৈন্য তিনি তৎক্ষণাৎ নাটোরে পাঠিয়ে দিলেন,—রাজবাড়ী লুট ক'রে সমস্ত টাকা-পয়সা নিয়ে আসতে।

নবাবের সৈন্য গিয়ে নাটোরে হানা দিতেই রামকান্তের প্রাণ ভয়ে কেঁপে উঠলো। এক্ষুণি সিপাইরা বাড়ীতে ঢুকে সমস্ত লুটপাট ত' ক'রে নেবেই,—তাঁকেও বেঁধে না নিয়ে গেলে হয়!

রাণী ভবানী স্বামীর হাত ধ'রে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—ওগো চল, মান-সম্মান নিয়ে আমরা পালিয়ে যাই, রাজ্য যায় যা'ক্।

রামকান্তকে যারা সব কুপরামর্শ দিচ্ছিল, তারা কেউ এ বিপদে তাঁকে রক্ষা করতে এলো না। তিনি রাণী ভবানীকে নিয়ে খিড়কীর দরজা দিয়ে পালিয়ে নৌকায় চ'ড়ে চ'লে গেলেন। তাড়াতাড়িতে টাকাকড়ি ধনরত্ন কিছুই নিতে পারলেন না, রাণীর গায়ে যে গয়না ছিল তাই মাত্র সঙ্গে গেল।

একটু পরেই নবাব-সৈন্য রাজবাড়ীতে ঢুকে সব লুটপাট ক'রে নিতে লাগলো। কেউ তাদের বাধা দিতে পারলো না।

রাণী ভবানীর পরামর্শে রাজা রামকান্ত মুর্শিদাবাদে গেলেন,—যদি নবাবকে ধ'রে একটা কিছু উপায় করা যায়, এই আশায়।

নবাব-বাড়ীর অল্প একটু দূরেই তাঁরা বাসা ক'রে আছেন। সুবিধে মত একদিন রামকান্ত নবাব-দরবারে গিয়ে নিজের দুঃখের কথা জানাবেন মনে করছেন, কিন্তু তেমন সুযোগ আর ঘটে উঠছে না।

সুযোগের অপেক্ষায় থেকে থেকে অনেক দিন চ'লে গেল। রাণী

ভবানীর গায়ে যে গয়না ছিল তাই বেচে বেচেই দিন চলছে। অত সুখে যাঁরা ছিলেন আজ তাঁদের এই দশা,—তাঁদের বড্ড কষ্ট!

একদিন হঠাৎ দয়ারামের সঙ্গে রামকান্তের দেখা হ'লো। রামকান্ত কেঁদে ফেললেন, আর যে এ দুঃখ সহ্য হয় না!

দয়ারাম বুঝতে পারলেন, রামকান্তের খুব শিক্ষা হয়েছে।

রাণী ভবানীও চোখের জল মুছতে মুছতে দয়ারামকে তাঁদের দুঃখের কথা জানিয়ে এর একটা উপায় করতে অনুরোধ করলেন। তাঁর অনুরোধে ও চোখের জলে দয়ারামের প্রাণ গ'লে একেবারে জল হয়ে গেল।

তিনি বল্লেন,—"তিন দিনের মধ্যে আবার তোমাদের রাজ্য ফিরে পাবার ব্যবস্থা করছি দিদিমণি,—তুমি ভেবো না। তবে কিছু টাকার দরকার, অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার।"

ভবানী বল্লেন,—"অত টাকা কোথা পাব দাদু? দেখছেন ত' আমাদের অবস্থা। কাণাকড়িটাও বাড়ী থেকে আনতে পারিনি, আমার গায়ের গয়না ক'খানা কেবল সম্বল, তাই বেচে বেচে দিন চলছে। যে ক'খানা আছে আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি, এই দিয়ে যা' হয় করুন।"

রাণী ভবানী তাঁর গয়নাগুলো পুঁটুলি ক'রে দয়ারামের হাতে তুলে দিলেন।

দয়ারামের চক্রান্তে আলিবর্দী দেবীপ্রসাদের ওপর অত্যন্ত রেগে গিয়ে তাকে আবার সিংহাসনচ্যুত করলেন। রামকান্ত নিজের রাজ্য আবার ফিরে পেলেন। নাটোরে এসে তাঁর মতিগতি সব বদলে গেল। এবার দয়ারামের পরামর্শ ছাড়া তিনি কোন কাজ করতেন না।

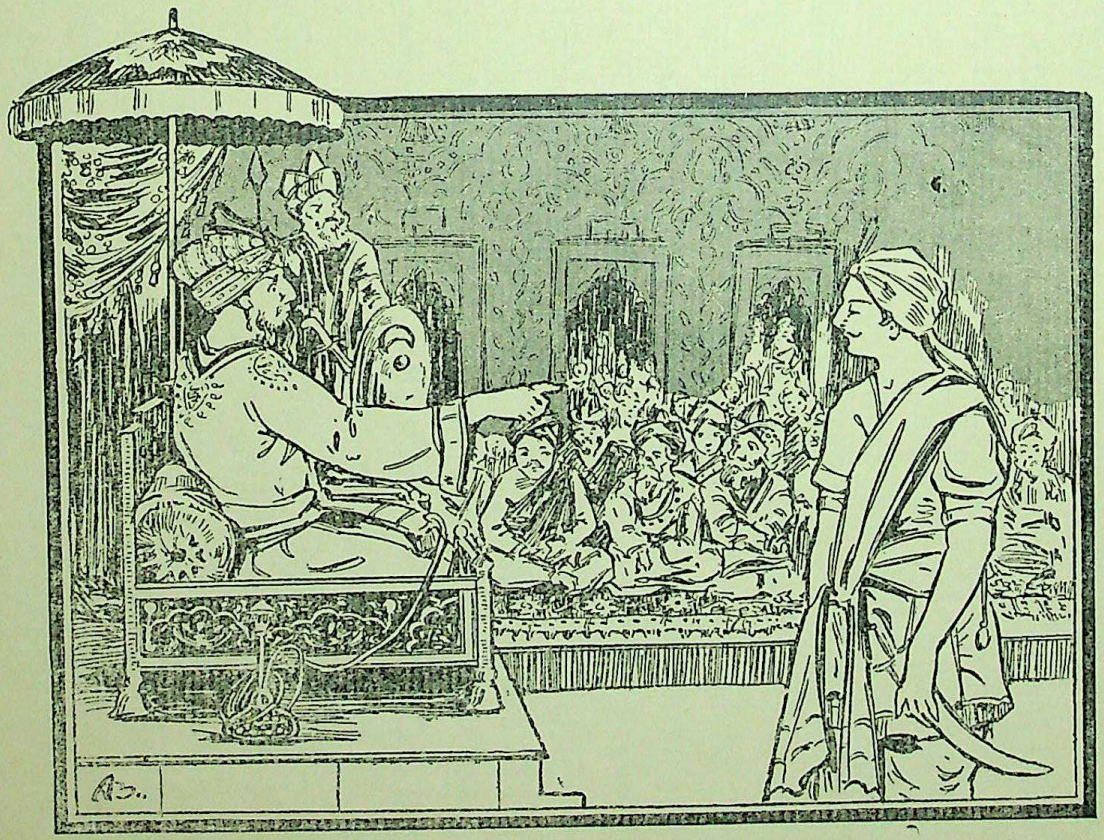

আলিবর্দীর দরবারে দেবীপ্রসাদ

চার

প্রকাণ্ড রাজ্য, অগাধ ঐশ্বর্য, কিন্তু রাজা-রাণীর মনে সুখ নাই। রাণী ভবানীর একে একে দু'টি ছেলে হ'ল, কিন্তু ভগবান দু'টিকেই শৈশবে মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিলেন। তারপর একটি মেয়ে হ'লো—মেয়েটির নাম তারাসুন্দরী। তারাসুন্দরীও বিয়ের অল্পদিন পরেই বিধবা হ'য়ে মায়ের কোলে ফিরে এসেছিলেন।

কিছুদিন পরে রাণী ভবানীর কপাল ভাঙ্গলো। তিনিও বিধবা হলেন। সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সমস্ত সুখশান্তি স্বামীর চিতার আগুনে ভস্ম হয়ে গেল। স্বামীর মৃত্যুতে তিনি সংসার অন্ধকার দেখতে লাগলেন; অতবড় রাজ্য, অমন ঐশ্বর্য, অমন রাজবাড়ী তাঁর কাছে শ্মশান ব'লে মনে হতে লাগলো।

দারুণ শোকে-দুঃখে ভবানীর হৃদয় ভেঙ্গে গেলেও তিনি কর্তব্য ভুললেন না। স্বামীর অভাবে তিনিই এখন রাজ্যের কর্ত্রী। রাজ্যের ভালমন্দ, প্রজাদের সুখদুঃখ এখন তাঁকেই দেখতে হবে। তিনি রামকৃষ্ণ নামক একটি ছেলেকে পোষ্য নিয়ে তাঁর নামে রাজ্য চালাতে লাগলেন।

এবার তিনি প্রাণ ভ'রে দান-ধর্ম করতে লাগলেন। স্বামী বেঁচে থাকতে ইচ্ছামত তিনি তা' করতে পারতেন না। রাজ্য হাতে পেয়ে তাঁর মনে হতে লাগলো,—ধনদৌলত, রাজ্য, টাকাকড়ি ক'দিনের?—এসব কিসের জন্য? এসব পৃথিবীর জিনিষ, পৃথিবীতেই প'ড়ে থাকবে, মরবার সময় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাওয়া যাবে না। জগতের লোকের উপকারের জন্যই এ টাকাকড়ি ব্যয় করা ভাল। রাণী ভবানীর যে সব দানের কথা শোনা যায়, তখনকার আর কোনো রাজা-মহারাজার নামে তা' শোনা যায় না।

তিনি রাজবাড়ীতে অন্নসত্র খুললেন। যে যখন আসতো,—দিন নেই, রাত নেই—রাণী ভবানীর অন্নসত্রে খেয়ে যেতো। যারা সেখানকার রান্না খেতো না, তারা চাল, ডাল, তেল, ঘি, চিনি, ময়দা, নুন, মসলা, কাঠ ইত্যাদি যাবতীয় সামগ্রী পেতো, পৃথক রান্নাঘর ছিল, সেখানে রান্না করে খেতো। তাঁর আদেশ ছিল, তাঁর জমিদারীতে কেউ অনাহারে থাকতে পারবে না। হিন্দু-মুসলমান যে কোন ধর্মের বা জাতির লোক রাণীর কাছে গিয়ে তার দুঃখ জানাতো, রাণী তখনই তাকে উপযুক্ত মত দান করতেন। কেউ তাঁর কাছে গিয়ে নিরাশ হ'য়ে ফিরে আসতো না।

রাজ্যের যেখানে যখন জলকষ্টের সংবাদ পেতেন সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেখানে দীঘি বা পুকুর কাটিয়ে দিয়ে প্রজাদের জলকষ্ট দূর ক'রে দিতেন।

যাতে তাঁর রাজ্যে ব্যারাম-পীড়া বেশী না হয়, সেজন্যে তিনি নানা জায়গায় দাতব্য-চিকিৎসালয় ক'রে দিয়েছিলেন। প্রজারা সেখান থেকে বিনা পয়সায় ওষুধ পেতো। শুধু কি তাই?—তিনি মাইনে-করা আটজন কবিরাজকে গ্রামে গ্রামে গরীব প্রজাদের চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দিতেন। তাঁরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে চিকিৎসা করতেন, সে জন্য এক পয়সাও দিতে হ'তো না। কেবল ওষুধ নয়, গরীব রোগীদের পথ্যও বিনা পয়সায় দেওয়া হ'তো। কবিরাজদের প্রত্যেকের সঙ্গে দু'তিন জন ক'রে চাকর থাকতো। তারা ভারে ক'রে সাগু, বার্লি, মিছরি, লেবু, পুরাণ চাল, ছোট মাছ,—এসব রোগীদের দরকারী জিনিস ব'য়ে নিয়ে যেতো। যার যা দরকার, কবিরাজেরা তাকে তা ব্যবস্থা ক'রে দিতেন।

দুর্গাপূজার সময় প্রত্যেক বৎসর দু'হাজার শাড়ী কিনে তিনি

কুমারী ও সধবা স্ত্রীলোকদের দান করতেন। তা' ছাড়া প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত প্রত্যহ একশ' কুমারীকে সোনার গয়না দিয়ে পূজো করতেন। পূজোর সময় বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় পেতেন, তাতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল।

অনেক সময় রাণীর নিজ হাতে সকলকে দান করবার সুবিধা হ'তো না, অথচ লোকেরা এসে বিমুখ হয়ে ফিরে যাবে সেও অন্যায়। এজন্যে তিনি নিয়ম করেছিলেন, একশ' টাকা পর্যন্ত দান করতে হ'লে রাণীকে জানাতে হবে না, দেওয়ান নিজেই তা পারবেন। একশ' টাকার বেশী দান করবার দরকার হ'লে তা রাণীকে জানিয়ে করতে হবে।

একবার রাণী বহু গরীবকে সাহায্য করবেন ব'লে আশা দিয়েছিলেন। সেবার ভাল খাজনা আদায় হ'লো না, যা আদায় হলো তা' থেকে নবাব-সরকারে খাজনা পাঠিয়ে সামান্য মাত্র রইলো। অথচ তিনি দান করবেন ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। খামারের শস্য বেচে টাকা যোগাড় করবার হুকুম হলো। কিন্তু তাতে পাওয়া গেল মাত্র তিন লক্ষ টাকা। চাই—আরো বেশী। দানের দিন ক্রমে এগিয়ে এলো, বাকী টাকা আর যোগাড় হলো না। অনেকে রাণীকে ঐ টাকা দিয়েই যতদূর কুলোয় দান করতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে ভাবেই হোক্ তা' পূরণ করবেন। তাঁর যথেষ্ট অলঙ্কার ছিল, তিনি তাই থেকে কিছু বেচে বাকী টাকার যোগাড় ক'রে দান-কার্য শেষ করলেন।

হাজার হাজার ব্রাহ্মণকে রাণী জমি দান করেছিলেন। বাংলা-দেশের প্রায় জেলাতেই রাণী ভবানীর দেওয়া দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল। সে দু'এক বিঘা জমি নয়,—প্রায় পাঁচ লক্ষ বিঘা। এখনো কেউ কেউ সে সব দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর জমি ভোগ করছে।

রাণী ভবানীর দানের অন্ত ছিল না। কত ভাবে কত দিকে যে তিনি দান করতেন তা' বলে শেষ করা যায় না। তাঁর দানের গুণে রাজ্যের গরীব দুঃখীরা অভাব বলে একটা কিছু মনে করতে পারতো না। যার যখন কিছু অভাব হতো, রাণীর কাছে এলে তখনই তা দূর হতো।

পাঁচ

অত-বড় রাজ্যের কর্ত্রী হ'লেও কোনরকম অহঙ্কার তাঁর মনে ছিল না। তিনি সাধারণ গরীবের ঘরের বিধবাদের মত অতি সাদাসিধেভাবে দিন কাটাতেন। রাত ভোর হওয়ার অনেক আগেই তিনি ঘুম থেকে উঠে জপ করতে বসতেন। জপ শেষ ক'রে নিজেই বাগানে গিয়ে ঠাকুর পূজার জন্যে ফুল তুলতেন। তখনো অন্ধকার থাকতো, দাসীরা তাঁর সঙ্গে মশাল জ্বেলে নিয়ে যেতো। তারপর স্নান-আহ্নিক, জপ, শিবপূজা, গঙ্গাপূজা ইত্যাদি শেষ ক'রে পুরাণ-পাঠ শুনতে বসতেন। দুপুরবেলা বাড়ীর সকলের খাওয়া-দাওয়ার পরেও তাঁর বিশ্রাম ছিল না। তিনি দেওয়ান এবং আরো দু'চারজন বড়-বড় কর্মচারীকে ডেকে রাজ্যের নানা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতেন এবং যাকে-যাকে যা বলবার ব'লে দিতেন, তারা রাণীর আদেশ লিখে নিতো। পাছে কোনো গোলমাল হয় এজন্যে রাণী কাগজে নিজে সই ক'রে তাঁর নামের মোহর এঁকে দিতেন। সন্ধ্যায় আবার জপতপ পুরাণ-পাঠ শেষ ক'রে জমিদারীর কাজকর্ম দেখতেন। তারপর প্রজাদের নালিশের বিচার করতেন। শেষে বাড়ীর সকলের খাওয়া-দাওয়ার তদারক ক'রে নিজে জল খেয়ে রাত দেড়-প্রহরের সময় শুতে যেতেন। এমনিভাবে তাঁর সারাটা জীবন কেটেছিল। অত-বড় প্রকাণ্ড জমিদারীর মালিক ব'লে এক মুহূর্তও তিনি আলস্যে নষ্ট করেননি।

ছয়

ক্রমে পোষ্যপুত্র রামকৃষ্ণ বড় হলেন। এবার রাণী তাঁর হাতে রাজ্য ছেড়ে দিয়ে কাশী গিয়ে থাকতে ইচ্ছা করলেন। প্রজারা যেদিন শুনলো, রাণী তাদের ছেড়ে কাশী চ'লে যাচ্ছেন, সেদিন যেন সমস্ত দেশটা ভেঙে এসে তারা নাটোরে উপস্থিত হলো। সবারই মুখে এক কথা,—রাণীমা, আপনি কাশী গেলে আমরা কার মুখ চেয়ে থাক্‌বো? কে আমাদের ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল দেবে?—বিপদ-আপদে আমরা কার কাছে ছুটে এসে দাঁড়াবো?

রাণী সকলকে বুঝিয়ে বল্‌তে লাগলেন যে,—তাদের কোন ভয় বা চিন্তা নাই, রাজা রামকৃষ্ণও তাঁর মতই প্রজাদের দেখবেন।

কিন্তু প্রজারা সে-কথায় ভুল্‌লো না। তারা তাদের অন্নপূর্ণা মাকে কিছুতেই কাছছাড়া হ'তে দেবে না।

শেষে রাণী তাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন,—"আমি বেশীদিন সেখানে থাকবো না; বাবা বিশ্বনাথ এবং মা অন্নপূর্ণার চরণ দর্শন ক'রে কিছুদিন পরেই আবার দেশে ফিরবো।"

প্রজারা এবার সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেল।

পদ্মার জলে সতেরো শো নৌকা সার বেঁধে চলেছে। রাণী ভবানী কাশী যাচ্ছেন, সঙ্গে তাঁর সাজ-সরঞ্জাম জিনিসপত্র যাচ্ছে। নাটোরের রাণীর মতই তিনি চলেছেন।

তীরে সহস্র-সহস্র প্রজা দাঁড়িয়ে, তাদের চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে, আর মুখে কেবল 'হায় রাণীমা, আমাদের ছেড়ে তুমি কোথা যাচ্ছো'—এই শব্দ!

এ-দৃশ্য দেখে রাণী ভবানীর চোখ জলে ভ'রে এলো। তিনি আঁচলে চোখ মুছতে-মুছতে চললেন। এত লোক তাঁকে ভালোবাসে, এত লোক তাঁর জন্যে কাঁদে, তিনি সেইদিন তা' বুঝতে পার্‌লেন।

নৌকা যতই চলতে লাগলো, ততই 'রাণীমার জয়', 'অন্নপূর্ণার জয়' শব্দে আকাশ-বাতাস ভ'রে উঠ্‌তে লাগলো।

যতদূর নৌকা দেখা যায়, প্রজারা দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে দেখ্‌লে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলতে-ফেলতে বাড়ী ফিরে এলো। তাদের মনে হ'তে লাগলো, ছোট শিশু যেমন মাকে হারিয়ে নিঃসহায় হয়ে পড়ে, তারাও আজ তেমনি আশ্রয়হীন হয়ে পড়লো।

সাত

কাশীতে এসে রাণীর শোকতাপদগ্ধ মন যেন অনেকটা শান্তি পেলে। তিনি প্রাণ খুলে ধর্মকর্ম করতে লাগলেন। অল্পদিনের মধ্যেই কাশী তাঁর দানের কথায় পূর্ণ হয়ে উঠ্‌লো। সবাই সেখানে তাঁকে 'দ্বিতীয়া অন্নপূর্ণা' ব'লে ডাকতে লাগলো।

তিনি কাশীতে নিজের বাড়ীতে একটি প্রকাণ্ড পাথরের চৌবাচ্চায় প্রত্যহ আট মণ ছোলা ভিজিয়ে রাখতেন। কেউ জল খেতে এলে তাকে ঐ ভিজানো ছোলা ও ঠাণ্ডা জল দেওয়া হতো। এত লোক রোজ আসতো যে, সেই আট মণ ছোলা—প্রায় সবই শেষ হয়ে যেতো।

বাড়ীতে প্রত্যহ যে দেবদেবীর ভোগ হতো, তাতে নানারকম সুস্বাদু ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা থাকতো, সেই ভোগে একটি নয়, দুটি নয়, দশটি নয়, পনেরোটি নয়—প্রায় পাঁচ হাজার লোক পেট পূরে তৃপ্তির সঙ্গে প্রসাদ পেতো।

অন্নপূর্ণার মন্দিরে প্রত্যহ গরীব-দুঃখীদের পঁচিশ মণ চাল ভিক্ষে দেওয়া হতো। তাছাড়া রাণীর বাড়ীতে রোজ ১০৮ জন সন্ন্যাসী, কুমারী, দণ্ডী ও বিধবা নিজের নিজের ইচ্ছা ও রুচিমত খেয়ে এক-এক টাকা দক্ষিণা পেতো।

অনেক লোক শেষ-বয়সে কাশীতে এসে বাস করে। কিন্তু তাদের সকলের অবস্থা ভালো নয়, সকলে বাড়ী ভাড়া ক'রে থাকতে পারে না। তাই দেখে দয়াবতী রাণী ভবানী কাশীতে বহু বাড়ী তৈরী ক'রে দিলেন। শুধু বাড়ীতে থাকবার ব্যবস্থা নয়, যাতে তারা যাবজ্জীবন সেখানে ব'সে খেতে পারে, তিনি তারও ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। কাশীর নানা স্থানে রাণী দেবমন্দির তৈরী ক'রে সেখানে দেবতা প্রতিষ্ঠা করতে লাগলেন। আজও কাশীতে রাণী ভবানীর শত-শত কীর্তি, তাঁর দয়া ও দানশীলতার পরিচয় দিচ্ছে—আজও শত শত লোক তাঁর গুণগান করছে।

পথিকেরা রাস্তায় চল্‌তে-চল্‌তে বড় কষ্ট পায় দেখে রাণীর বড় দুঃখ হলো। তিনি কাশীর পাঁচ ক্রোশের মধ্যে এক-এক ক্রোশ দূরে-দূরে এক-একটি পুকুর কাটিয়ে গাছ পুঁতে পথিকদের বিশ্রামের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। পথিকেরা সেই গাছের শীতল ছায়ায় ব'সে বিশ্রাম এবং জলপান ক'রে ঠাণ্ডা হয়ে আবার যার-যার পথে চ'লে যেতো। পথিকদের জন্য সেখানে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল। যার ইচ্ছা হতো সে চাল, ডাল, কাঠ, থালা, ঘটি, বাটি ইত্যাদি চেয়ে নিয়ে রান্না ক'রে খেতো। ক্ষুধার্ত পথিকেরা সুস্থ হয়ে রাণীর গুণগান করতে-করতে আবার চলতে আরম্ভ করতো।

রাণীর দয়া পৃথিবীর সমস্ত জীবজন্তুর প্রতি সমান ছিল। পশুপক্ষী, এমন কি, সামান্য পোকা-মাকড়ও তাঁর দয়ায় বঞ্চিত হয়নি। গাছের নীচে-নীচে চাল, ডাল, ছোলা, ভাত ইত্যাদি ছড়িয়ে দেওয়া হতো ; পাখীরা দলে দলে এসে আনন্দ কলরব করতে-করতে সেইসব খেতো। পিঁপড়ের খাওয়ার জন্যে গর্তের কাছে চিনি, সন্দেশ ইত্যাদি দেওয়া হতো।

প্রতি বৎসর নাটোর থেকে হাজার নৌকায় রাণী ভবানীর দানের জিনিসপত্র কাশীতে আসতো। সেইজন্যে কোনো জিনিসেরই অভাব থাকতো না।

আট

একবার নানা কারণে নাটোর থেকে নৌকা আসতে দেরী হয়ে গেল। রাণীর হাত একেবারে খালি, দানকার্য বন্ধ হবার উপক্রম। রাণীর ভারী ভাবনা হলো। শেষে তিনি টাকা কর্জ ক'রে আপাতত কাজ চালাবেন ঠিক করলেন। নাটোর থেকে টাকা এলেই তা শোধ ক'রে দেবেন।

অমৃতলাল হচ্ছে কাশীর একজন নামজাদা ধনী বণিক। রাণী এক লক্ষ টাকা কর্জ চেয়ে তার কাছে লোক পাঠিয়ে দিলেন।

অমৃতলাল টাকা তো দিলেই না, বরং আরো ব'লে দিলে,—অমন অনেক রাণী দেখেছি, কাশীতে এসে বড়মানুষী ফলায়, তারপর টাকা-পয়সা ধার ক'রে একদিন গোপনে স'রে পড়ে। তারপর আর খুঁজে পেতে সে-সব রাজরাণীর কোনো পাত্তাই পাওয়া যায় না!

সেই রাত্রেই অমৃত স্বপ্ন দেখ্‌লে—যেন স্বয়ং দেবী অন্নপূর্ণা ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে তাকে শাসিয়ে বলছেন,—"ওরে তুই কাকে কি ব'লেছিস্? রাণী ভবানীর লোক টাকা চাইতে এসেছিল, তাকে টাকা না দিয়ে, রাণীকে আরো অপমান করেছিস্? ভালো চাস্ তো টাকা দিয়ে আসিস্।"

পরদিন ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে অমৃত লক্ষ টাকা নিয়ে গিয়ে রাণী ভবানীর কাছে উপস্থিত হল। তখন রাণী অন্নপূর্ণার মন্দিরে ব'সে পূজা করছিলেন। অমৃত দেখে অবাক্ হয়ে গেল,—সে দেখ্‌লে রাণী ভবানীতে আর দেবী অন্নপূর্ণায় কোনো প্রভেদ নাই। দু'জনে মিশে যেন এক হয়ে গেছেন, একটা উজ্জ্বল জ্যোতিতে সমস্ত মন্দির ভ'রে উঠেছে। বণিক অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে সে-দৃশ্য দেখলে। ভক্তিতে তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেল। সে সেই লক্ষ টাকা মন্দিরের দুয়ারে রেখে, গড় হয়ে প্রণাম ক'রে চ'লে গেল।

একবার রাণী ভবানী গয়াতে পিণ্ডদান করতে গিয়েছিলেন। টিকারীর রাজা ব'লে পাঠালেন যে, রাণী যদি পাঁচ লক্ষ টাকা না দেন তবে তাঁকে পিণ্ডদান করতে দেওয়া হবে না।

টিকারী-রাজ সোনার থালায় ক'রে রাণী ভবানীকে তাঁর পাগড়ী পাঠিয়ে দিলেন।

রাণী অত্যন্ত অপমানিত মনে ক'রে মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট সব ব'লে পাঠালেন। নবাব তখনই টিকারী আক্রমণের আদেশ দিলেন। টিকারীর রাজা ভয় পেয়ে, রাণীর নিকট ক্ষমা চেয়ে, বিনা-করে পিণ্ডদানের অনুমতি দিলেন। দয়াবতী ভবানী রাজাকে ক্ষমা

করেছিলেন এবং এই দুর্ব্যবহারের বিনিময়েও তাঁকে তিন লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন।

রাণী ভবানী কখনো কারো শত্রুতার কথা মনে রাখতেন না, ঐ টিকারী-রাজাকেই আর-একবার খুব বিপদের সময় তিনি উদ্ধার করেছিলেন।

নবাব-সরকারে সময়মত খাজনা দাখিল করতে না পারলে সেকালে কয়েদ রাখার নিয়ম ছিল। টিকারীর রাজা একবার কয়েদ হয়ে রাণীর কাছে টাকা চেয়ে পাঠান। দয়াবতী রাণী সঙ্গে সঙ্গে সেই টাকা দিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন।

রাণী ভবানীর প্রতি পূর্ব ব্যবহারের জন্যে রাজার মনে অনুতাপ হয়। তিনি এই ব'লে রাণী ভবানীকে তাঁর পাগড়ী একখানা সোনার থালায় ক'রে পাঠিয়ে দেন যে, "তিনি আগে তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু দয়াবতী রাণী তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রে চিরদিনের মত অনুগত সন্তান ক'রে নিয়েছেন।"

গয়াতেও রাণী ভবানীর কীর্তির অন্ত নাই। সেখানে তিনি অনেক মন্দির তৈরী ক'রে তাতে দেবতার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গয়া ফল্গুনদীর ধারে। ফল্গু অন্তঃসলিলা, অর্থাৎ উপরে বালি নীচে জল, বালি খুঁড়ে তবে জল বার করতে হয়। তা' নাহ'লে জল পাওয়া যায় না। এজন্য তীর্থ-যাত্রীদের স্নান, পূজা, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি করতে বড় কষ্ট পেতে হতো। এই দেখে রাণী ভবানী যাত্রীদের দুঃখ দূর করতে মনস্থ করলেন। তিনি গয়ার কাছে দুইখানি গ্রাম কিনে সেই গ্রামের কৃষকদের প্রত্যেককে কিছু-কিছু জমি দিয়ে বহু কৃষক বসিয়ে দিলেন। তাদের সঙ্গে এই চুক্তি রইলো যে, তারা প্রত্যেকদিন ভোর হবার আগেই ফল্গুনদীতে বালি খুঁড়ে দুটি কুয়ো ক'রে রাখবে, যাত্রীরা সেই জলে তর্পণ, পূজা ইত্যাদি করবে।

নয়

পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজেরা বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলাকে হারিয়ে দিয়ে এদেশের রাজা হ'লেন। তাঁরাও রাণী ভবানীকে শ্রদ্ধা করতেন।

একবার ভালোরকম খাজনা আদায় না হওয়ায় প্রায় এগারো লক্ষ টাকা সদর-খাজনা বাকী প'ড়ে গেল। তখন শোর সাহেব নামে একজন ইংরেজ এদেশের জমিদারদের কাছ থেকে ইংরেজদের পাওনা খাজনা আদায় করতেন। সাহেব, রাণী ভবানীর বাকী খাজনা আদায় ক'রে নেওয়ার জন্যে তাঁর জমিদারী টুক্‌রো-টুকরো ক'রে নূতন-নূতন লোকদের কাছে পত্তন দেওয়ার মতলব আঁট্‌লেন। এমনসময় তিনি একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন যে, এক ভয়ানক কালী-মূর্তি তাঁকে বলছেন, "রাণী ভবানীর এক টুক্‌রো জমি যদি তুই কাউকে দিস্ তবে এই যে খড়্গ দেখছিস্, এই দিয়ে তোর মাথা কেটে ফেলবো।"

এই স্বপ্ন দেখার পর সাহেব রাণী ভবানীর জমিদারীতে আর হাত দিতে সাহস করেননি।

১১৭৬ সালে সারা বাংলা জুড়ে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। সেই দুর্ভিক্ষে এদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক না খেয়ে মারা গিয়েছিল। সেই ভীষণ দুর্ভিক্ষের কথা শুনে আজও লোক ভয়ে শিউরে উঠে। সেই দুর্ভিক্ষের নাম 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'। রাণী ভবানী সেই দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর সমস্ত টাকা-কড়ি এবং ধান ইত্যাদি প্রজাদের জীবন রক্ষার জন্য বিলিয়ে দিয়েছিলেন। এতে তাঁর হাত একেবারে খালি হয়ে পড়েছিল।

রাজা রামকৃষ্ণ রাজ্য চালাতেন, কিন্তু তিনি রাজা হয়েও সন্ন্যাসীর মত থাকতেন। রাণী বেঁচে থাকতে-থাকতেই তিনি মারা যান। বাধ্য হয়ে রাণীকে শেষ বয়সে আবার রাজ্য হাতে নিতে হয়।

শেষ বয়সে রাণী বড়নগরে গঙ্গাতীরে গিয়ে বাস করেছিলেন। গঙ্গাতীরেই ৭৯ বছর বয়সে পুণ্যবতী রাণী ভবানীর মৃত্যু হয়। সেই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি নিজ হাতে রান্না ক'রে খেতেন, পূজা-আহ্নিক, জপতপ একদিনের জন্যেও বাদ পড়েনি।

প্রায় দেড়শো বছর হতে চললো সেই দ্বিতীয় অন্নপূর্ণা রাণী ভবানী স্বর্গে চ'লে গেছেন, কিন্তু আজও লোকে লক্ষ-কণ্ঠে তাঁর দয়ার কথা ব'লে থাকে। তিনি মরেও অমর হয়ে আছেন।

সংসারে তাঁরাই ধন্য, যাঁদের প্রাণ পরের জন্য কাঁদে।

—শেষ—

=মেয়েদের জন্য পৌরাণিক গল্প=

দ্রৌপদী ॥৶০ সীতা ॥৶০

ভারত নারী ॥৶০

•

সুভদ্রা উষা বেহুলা শর্ম্মিষ্ঠা
সাবিত্রী সংযুক্তা শকুন্তলা সতী
শৈব্যা পার্ব্বতী দময়ন্তী চিন্তা

প্রত্যেকখানির মূল্য ॥০ আনা

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

চিত্রে জয়দেব

দু'রংএ ছাপা দাম ছয় টাকা

=রূপকথা=

ঠাকুরমার ঝুলি ৩৲
ঠাকুরমার গল্প ১৲
অপরূপ কথা ১৲
গল্পের মায়াপুরী ২৲
চানে গল্প ১৲ রূপকথা ৸০
নিঝুমপুরের স্বপন কথা ১৲
মন ছোটে মোর তেপান্তরে ৸০

অনেক দিনের অনেক কথা ২৲
আলো দিয়ে গেলো যারা ২৲
পেস্তার বরফি ১॥০ হাসি কান্না ১৲
জন্মদিনের উপহার ২৲
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে ১৲
গল্পের আলপনা ২৲
প্রবাদের গল্প ৸০ গল্পে উপদেশ ৸০

=টার্জান সিরিজ=

অ্যাডভেঞ্চার অব্ টারজান ১৲
টার্জান অ্যাণ্ড হিজ্ মেট ১৲
টার্জান দি এপ্‌ম্যান ১।০
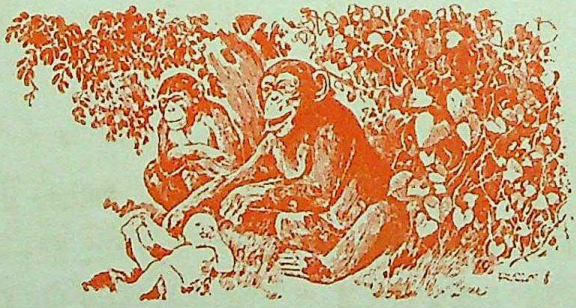
কিং কঙ্ ১।০ সন্ অব্ কঙ্ ১।০